ষোড়শীপূজা

অভিষেক উজান

যখন নারী অবহেলার পাত্রী বা আর পাঁচটা সাধারণ ভোগ্য বস্তুর মতোই মূল্যহীন ও তুচ্ছ, তখন নারীর নবপরিচয় নিয়ে, নবরূপ ধরে সর্বগ্রাসী মাতৃসত্তায় জগতকে আপন করে নিতে 'শ্রীরামকৃষ্ণপ্রেমসুরধুনী' শ্রীমা সারদা দেবীর আবির্ভাব। সেই আবির্ভাবকেই সুস্বাগত জানিয়ে ষোড়শীপূজার মাধ্যমে জগতের চালচিত্রে তাঁর বোধন করলেন স্বয়ং যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ।

নারীমাত্রই আদ্যাশক্তির প্রকাশ, আর নারীর লৌকিক প্রকাশ কন্যা, জায়া ও মাতৃরূপে। মাতৃভাবই শুদ্ধতম ও সর্বাপেক্ষা কল্যাণপ্রদ ভাব। শ্রীশ্রীমায়ের এবারে আগমন যে সেই ভাবেরই প্রকাশের জন্য, তা তাঁর মুখেই শোনা যায়—''ঠাকুরের [শ্রীরামকৃষ্ণের] জগতের প্রত্যেকের উপর মাতৃভাব ছিল। সেই মাতৃভাব জগতে বিকাশের জন্য আমাকে এবার রেখে গেছেন।" একথার প্রমাণ তাঁর জীবন।

ভগবান বুদ্ধ, শংকর, চৈতন্যদেবের ধর্মজীবনে নারী এক প্রহেলিকা। শংকরাচার্য বলেছেন, ''নারী নরকের দ্বার।" তুলসীদাসের দোঁহায় ''নারী দিনকো মোহিনী, রাতকো বাঘিনী।" কিন্তু অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনবীণায় ঝংকৃত হয়েছে নারীর নবপরিচয়—'ব্রহ্মময়ীস্বরূপা'।

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ৫ জুন অমানিশায় ঘটেছিল সেই অভূতপূর্ব ঘটনা—দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল 'ষোড়শীপূজা'। ঘটে-পটে বা শ্রীযন্ত্রে নয়; জীবন্ত মানুষে। তিনি তাঁর ধর্মপত্নীকে পূজার আসনে বসিয়ে পূজা করলেন। ''মাটির প্রতিমায় তাঁর পূজা হয়—আর মানুষে হয় না?" অতএব এই পূজা বাস্তবতার আঙ্গিকে খুবই প্রাসঙ্গিক। শ্রীশ্রীমাকে যদি মানবীরূপে দেখি, তাহলে এ-পূজা যেন যুগাবতার কর্তৃক প্রদত্ত 'মাতৃভাব প্রচারের চাপরাশ'। আর যদি দেবীরূপে দেখি, তাহলে এ-পূজা জগৎসমক্ষে সাধারণের কাছে শ্রীশ্রীমা সম্পর্কে এক অভিজ্ঞানপত্র।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর যথাযোগ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা, নারীকে তার আত্মমর্যাদা সম্পর্কে সচেতন করা ছিল এই পূজার সামাজিক ফল, যা হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। আজ একবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বলা যেতে পারে, এই প্রয়াস

স্বাস্থ্যকর্মী ও আবৃত্তিকার

জগৎকল্যাণে নারীশক্তির জাগরণের শুভসূচনা। তাই পূজার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমাকে অভিসিঞ্চনান্তে শক্তির আবাহন করে বলেছিলেন, ''হে বালে, হে সর্বশক্তির অধীশ্বরী মাতঃ ত্রিপুরসুন্দরী, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর; ইঁহার (শ্রীমায়ের) শরীর মনকে পবিত্র করিয়া ইঁহাতে আবির্ভূতা হইয়া সর্বকল্যাণ সাধন কর।''

আমরা জানি শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে সুকঠোর তপস্যা করেছেন সুদীর্ঘ বারো বছর। স্বয়ং জগৎকারণ ঈশ্বরের এই তপস্যা লোককল্যাণেই। তাহলে বলা যায়, যেদিন তাঁর তপস্যার সমাপ্তি ঘটল সেদিনই তাঁর উদ্দেশ্য সাধিত হয়ে গেল। কিন্তু না, এ কোনও ইন্দ্রজাল নয়। যেহেতু অবতার-পুরুষদের সকল কর্মই সাধারণের মতো, তাই তার ফলাফলও সময়সাপেক্ষ, বস্তুত তাঁর এই সাধনলব্ধ সম্পদভাণ্ডারের চাবিকাঠি রইল সেই 'কুটোবাঁধা' মেয়েটির হাতে। যা উত্তরকালে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠবে সমগ্র জগতের কল্যাণে, যখন এই 'কুটোবাঁধা' মেয়েটির উত্তরণ হবে 'সঙ্ঘজননী' পদে। প্রশ্ন উঠতে পারে, শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই কেন জগৎকল্যাণে সেই শক্তি প্রয়োগ করলেন না? কেন শ্রীশ্রীমায়ের সাহায্যের প্রয়োজন হল? এর উত্তর পাই কথামৃতের পাতায়—''পুরুষ-প্রকৃতির যোগ। শিবকালীর মূর্তি, শিবের উপর কালী দাঁড়িয়ে আছেন। শিব শব হয়ে পড়ে আছেন, কালী শিবের দিকে চেয়ে আছেন। এই সমস্তই পুরুষ-প্রকৃতির যোগ। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, তাই শিব শব হয়ে আছেন। পুরুষের যোগে প্রকৃতি সমস্ত কাজ করছেন, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন!''

শুদ্ধ নির্গুণ ব্রহ্মের পক্ষে কোনও কর্মই সম্ভব নয়, শক্তির সাহায্য ছাড়া। তাই শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁর শক্তিকে দিয়ে এই জগৎকল্যাণরূপ কার্য সম্পাদন করলেন। বলাই বাহুল্য, একথা ভাবলে ভুল হবে যে দুজনের শক্তি আলাদা। এই শক্তি শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্য দিয়ে এবং তাঁর অপ্রকটকালে শ্রীশ্রীমায়ের মধ্য দিয়ে জগতে পরিব্যাপ্ত হয়েছে এবং হচ্ছে। এ-প্রসঙ্গে গীতার একটি শ্লোক খুবই প্রাসঙ্গিক : ''ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।'' (৯।১০)

তাই জগৎ সেদিন সেই অদৃষ্টপূর্ব ঘটনা ঘটতে দেখেছিল ভাবী রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সূতিকাগারে। এখানেই রাখাল প্রভৃতি বালক সাধকেরা তাঁদের সাধনজীবন শুরু করেছিলেন। সাধনার উদ্দেশ্য জ্ঞানলাভ, আর মায়ের কাছেই জ্ঞানের চাবি, তাই গুরুরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ জ্ঞানের দেবীর আবাহন করলেন। দেবী ষোড়শীরূপে শ্রীশ্রীমায়ের পূজা করে ভাবী সঙ্ঘের এই সূতিকাগারকে এযুগের শ্রেষ্ঠ শক্তিপীঠে পরিণত করলেন।

সাধকের হৃদয়পদ্ম প্রস্ফুটিত হয় জ্ঞানসূর্য উদয় হলে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণও সাধকদের হৃদয়পদ্ম উৎসারিত করার জন্যই 'বালার্কমণ্ডলাভাসাং' শ্রীবিদ্যার আরাধনা করলেন তাঁর বালক ভক্তদের সাধনজীবনের শুরুতেই। শ্রীশ্রীমাকে পরবর্তী কালে স্বামী অভেদানন্দ 'শুভ্রাং জ্যোতির্ময়ীং' বলে বর্ণনা করেছেন। ফলহারিণী অমাবস্যায় সারদারূপিণী দেবী ষোড়শীর মাতৃত্ব উদ্বোধিত হল। সাধকের সাধনার ফল শুচিশুভ্র কিন্তু তাঁকে অজানা অজ্ঞান-অন্ধকারের পথ ধরেই এগোতে হয়, তাই আরাধ্যা দেবী জ্যোতির্ময়ী হলেও তিথি ঘোর অমানিশা।

শ্রীশ্রীমা বলতেন, ''ঠাকুর তো আর ভাঙতে আসেননি।'' সত্যিই শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে যা কিছুই দেখা যায় তা পূর্বতনের যুগোপযোগী সংস্করণ। সঙ্ঘের শিশুকালে মাতৃস্নেহ ও মাতৃনিয়ন্ত্রণের যুগপৎ প্রয়োজন। তাই ত্রিকালদর্শী পুরুষ তাঁর সন্তানদের সঙ্ঘবদ্ধ করে তাঁদের আরাধ্যা দেবীরূপে সারদার প্রতিষ্ঠা করলেন। শিবাবতার আচার্য শংকরও দশনামী সম্প্রদায়কে সঙ্ঘবদ্ধ করে শৃঙ্গেরী মঠে দেবী ষোড়শী সারদার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দেবী ষোড়শী ও সারদা সেই এক আদ্যাশক্তির প্রকাশ।

নাম ও রূপ ভেদে, দেশ ও কাল ভেদে, পাত্রের আবাহনে তিনি 'যেখানে যেমন সেখানে তেমন'।

জীবের উদ্দেশ্য শিবত্বপ্রাপ্তি। সহস্রারে সেই পরম শিব মগ্ন মহাযোগে। একমাত্র শক্তির প্রসাদেই শিবের জাগরণ তথা কৃপালাভ সম্ভব। এদিকে শক্তিরূপিণী কুলকুণ্ডলিনী মূলাধারে নিদ্রাগতা। আর সাধককে এই কুলকুণ্ডলিনী শক্তির সহায়তাতেই ধীরে ধীরে স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাচক্রের বিস্তীর্ণ পথ অতিক্রম করতে হবে। এজন্য কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগাতে হবে, তাঁকে প্রসন্ন করতে সাধন করতে হবে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের জন্মলগ্নে শ্রীশ্রীমাকে আরাধ্যা দেবীরূপে প্রতিষ্ঠা করলেন যাতে নবীন সাধকরা চৈতন্যরূপিণী শক্তিস্বরূপিণী মায়ের প্রসাদে শিবত্বপ্রাপ্ত হন।

দেবী ষোড়শীর ধ্যানে পাই—'জগদাহ্লাদজননীং জগদ্‌রঞ্জনকারিণীম্' অর্থাৎ দেবী জগতকে আহ্লাদিত করছেন, আনন্দিত করছেন। শ্রীশ্রীমায়ের ধ্যানে পাই 'প্রসন্নবদনাং দেবীং' অর্থাৎ তিনিও প্রসন্না, আনন্দময়ী। এ-বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণেরও সমর্থন পাওয়া যায়। ষোড়শীপূজার আগেই তিনি শ্রীশ্রীমাকে বলেছিলেন, ''সাক্ষাৎ আনন্দময়ী-রূপ বলে তোমায় সর্বদা সত্য সত্য দেখতে পাই।'' শ্রীশ্রীমা শ্রীমুখে বলেছেন, নহবতে থাকাকালীনই তিনি অনুভব করতেন যে তাঁর হৃদয়ে আনন্দের পূর্ণঘট স্থাপিত আছে।

'শতরূপে সারদা' গ্রন্থে 'স্বে মহিম্নি' প্রবন্ধে স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ লিখেছেন, ''কালী, তারা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি দেবীগণ পরাশক্তির ভিন্ন ভিন্ন বিভূতি। কিন্তু শ্রীবিদ্যা বা ষোড়শীবিদ্যা পরমা শক্তির মুখ্য প্রকাশ বা তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ। দেবীর একটি মন্ত্রের নাম ত্রিকূট মন্ত্র। এই ত্রিকূট মন্ত্রের একটি অংশের নাম বাগ্‌ভবকূট, অপরটি কামরাজকূট, এবং অন্যটি শক্তিকূট। এই তিনটি অংশ লইয়াই ত্রিকূট মন্ত্র। আদ্যা শক্তি ত্রিপুরা জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াময়ী। বাগ্‌ভবকূট জ্ঞানকে প্রকাশিত করিতেছে, যাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী। কামরাজকূট ইচ্ছাকে প্রকাশিত করিতেছে এবং ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী কালী। শক্তিকূট ক্রিয়াকে প্রকাশিত করিতেছে এবং তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী দুর্গা বা বগলা। ত্রিকূট মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ষোড়শীর এই সকল দেবীই অংশ বা বিভূতি। সুতরাং শ্রীসারদাদেবী এই ষোড়শীর মানববিগ্রহ বলিয়া বিভিন্ন কালে এবং বিভিন্ন দৃষ্টিতে তাঁহাকে কালী, সরস্বতী, বগলা, পরমা প্রকৃতি প্রভৃতি নামে অভিহিত করা যায়।''

দেবী ত্রিগুণময়ী; বাগ্‌ভবকূট, শক্তিকূট এবং কামরাজকূটে যথাক্রমে দেবীর সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক গুণ প্রকাশিত। শ্রীশ্রীমায়ের জীবনে এই ত্রিবিধ প্রকাশই দেখা যায়। বাগ্‌ভবকূট অর্থাৎ সরস্বতীর প্রকাশ সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, ''ও সারদা সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে।'' শক্তিকূট অর্থাৎ দেবী বগলার প্রকাশ দেখা যায় কামারপুকুরে ভক্ত হরিশকে শাসনের সময়। মায়ের স্বীকারোক্তি : ''তখন... আমি নিজ মূর্তি ধরে দাঁড়ালুম। তারপর ওর বুকে হাঁটু দিয়ে জিব টেনে ধরে, গালে এমন চড় মারতে লাগলুম যে, ও হেঁ হেঁ করে হাঁপাতে লাগল।'' পরিশেষে কামরাজকূট অর্থাৎ দেবী কালিকার প্রকাশ। কামারপুকুর থেকে জয়রামবাটী যাওয়ার পথে শিবুদার প্রশ্নের উত্তরে মা স্বীকার করেছিলেন : ''লোকে বলে কালী।'' ডাকাত দম্পতি তেলোভেলোর মাঠে তাঁকে কালীরূপে দেখেছিল। সাধারণ মানবীর মতো লীলাকারিণী শ্রীশ্রীমা স্বয়ং সেই আদ্যাশক্তি, পরমাপ্রকৃতি; আর কালী, দুর্গা প্রমুখ দেবী তাঁরই অংশসম্ভূত।

আজ ষোড়শীপূজার প্রাক্‌লগ্নে দেবী ষোড়শীকে প্রণাম জানাই; এবং সর্বদেবদেবীস্বরূপিণী শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীকে প্রণাম জানাই। ✠